দ্বিতীয় অধ্যায় -

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক মহারাজা প্রাণনারায়ণের (১৬৩২-১৬৬৫)

শাসন সময় , ব্যক্তিগত জীবন , ব্যক্তিত্বেপাণ্ডিত্য ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় - পঞ্চ রত্ন সভা গঠন , শ্রীনাথ ও অন্যান্য কবিদের মৌলিক ও অনুবাদ কাব্য রচনায় উৎসাহ দান , শ্রীনাথের প্রাণনারায়ণ প্রশস্তি ।

বীরনারায়ণের মৃত্যুর পর যুবরাজ প্রাণনারায়ণ (১৬৩২-১৬৬৫) কোচবিহার রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হন ।'রাজোপাখ্যান' (পৃঃ২৫) মতে প্রাণনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করলে সকল প্রজা উৎসাহিত হয়ে রাজকর প্রদান করলেন । রাজ্যে যে সকল অমঙ্গল ছিল তা দূর হয়ে গেল। ঐ প্রসঙ্গে একটি উপমায় দেখা যায় আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা দূর হয়ে পূর্ণিমার চন্দ্র উদয়ে যেমন দীপ্তিমান পরিবেশের সৃষ্টি হয় , মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজ্যভার গ্রহণে দেশ তেমনি উজ্জ্বল হল। কিন্তু আসাম বুরঞ্জী , ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাস এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে'কোচবিহারের ইতিহাস'গ্রন্থে আমানতুল্লা প্রমাণ করেছেন যে বহিরাক্রমণ ও জ্ঞাতি বিরোধ প্রভৃতিতে তাঁর শাসনকাল অশান্তি পূর্ণ ছিল । ১৬৩৮ খৃঃ চট্টগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তা ইসলামখান এই রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি স্থায়ী ভাবে কোন অংশ অধিকার করতে পারেন নি । ১৬৬১ খৃঃ বাংলার শাসনকর্তা মীরজুমলা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ করেন । এই সংবাদে রাজা রাজধানী পরিত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন । মীরজুমলা অধিকৃত রাজ্যে নিজস্ব একজন শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করে আসাম বিজয়ে রওনা হন ।এই শাসনকর্তার অত্যাচারে প্রজারা ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয় এবং রাজাকে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করতে থাকে । তিনি এই সুযোগে অতি সহজেই মুসলমানদের তাড়িয়ে স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন । এই সময়ে রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় । পরে শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ খৃঃ রাজমহলে উপস্থিত হয়ে কোচবিহার আক্রমণের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন । রাজা এই সংবাদে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং যথারীতি কর দেন । ১৬৬৫ খৃঃ মহারাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যু হয় । মহারাজের তিন পুত্র । বিষ্ণুনারায়ণ , মোদনারায়ণ ও বাসুদেব নারায়ণ ।'রাজোপাখ্যান' মতে রাজার জীবিত কালেই বিষ্ণুনারায়ণের মৃত্যু হয় (নবখণ্ড ৭ম অধ্যায় পৃঃ ২৫) কিন্তু কোচবিহার ইতিহাস (পৃঃ ১১১) মতে বিষ্ণুনারায়ণ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ছিলেন বলে পিতা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন ।

শাসন রীতি ও বিবিধ কীর্তি - মহারাজা প্রাণনারায়ণ প্রজার সুবিধার জন্য নানা স্থানে রাস্তাঘাট পুল ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন । তাঁর রাজত্বকালে শিল্প কার্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল । নবাব মীরজুমলার সহযাত্রী এবং প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ তালিশ লিখেছেন ' কোচবিহার রাজধানী বাদশাহী ধরণের সুরম্য হর্ম্য এবং উদ্যানাদি দ্বারা সুশোভিত , রাজবাটীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে অন্তঃপুর , পাকাগার , স্নানাগার , নির্জনাবাস এবং জলের উৎস বিদ্যমান রহিয়াছে । রাজধানীর পথ ও গলিগুলি সরল এবং উহাদের উভয় পার্শ্বে রোপিত নাগেশ্বর ও কাঁচনা বৃক্ষ শ্রেণীদ্বারা সুসজ্জিত ।' উক্ত গ্রন্থকার আরও লিখেছেন যে কোচবিহার রাজ্যের সৈন্যগণ বিষাক্ত তীর , তরবারি এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে এবং শুনতে পাওয়া যায় যে অধিবাসীরা তন্ত্র মন্ত্রে পারদর্শী ও মন্ত্রপূত জলসেকের দ্বারা ক্ষতরোগ নিরাময় করতে পারে এবং ক্ষতরোগের সেবনীয় ও বাহ্য প্রয়োগের উপযুক্ত ঔষধ তাদের জানা আছে । পূর্বভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এ দেশের জলবায়ু , ভূমি , বৃক্ষলতা ও লোকের বাসস্থানগুলি উত্তম । এ দেশে 'নারায়ণী' নামে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল । ১৬৬৫ খৃঃ অনাবৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং ১৬৬৩ খৃঃ প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল । (কোচবিহারের ইতিহাস পৃঃ ১৬৬)

মধুপুরের শঙ্করপন্থী বৈষ্ণব ধর্মগুরু বনমালী গোঁসাই মহারাজ প্রাণনারায়ণের ধর্মগুরু ছিলেন । রিপুঞ্জয় দাস ও অন্যান্য বিরচিত 'মহারাজ বংশাবলী'তে (পৃঃ১৩, নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত) দেখা যায় প্রাণনারায়ণ একবার গঙ্গা তীরে আত্ম শরীরের ওজনে একটি সোনার আত্ম মূর্তি নির্মান করে ব্রাহ্মণদের দান করে ছিলেন । তা ছাড়াও শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের 'দ্রোণ পর্ব'র পুথিতেও দেখা যায় একবার তিনি গঙ্গাতীরে 'তুলা পুরুষ' দান করে ছিলেন । একদা তিনি চন্দ্রগ্রহণ কালে শ্রী শিরোমণি ভট্টাচার্যকে ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ কিছু ভূমি দান করেছিলেন ।

মহারাজ প্রাণনারায়ণ বোদেশ্বরী বিগ্রহের (জলপাইগুড়ি জেলার 'ভিতর গড়' স্থাপিত) সেবা পূজার জন্য ভূমি দান করেছিলেন । তিনি ষণ্ডেশ্বর ও বাণেশ্বরের শিব মন্দির নির্মান অথবা পুনঃসংস্কার করেছিলেন এবং মধুপুরের চতুর্ভুজ , শ্রীরাম পুরে মদনমোহন , কাগজকুটার চতুর্ভুজ , বনমালী পুরের বনমালী এবং দামোদর - পুরের মহাদেব মদনগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । কথিত আছে যে বাণেশ্বরের পুষ্করিণীর খনন অথবা পঙ্কোদ্ধার সাধন কালে মৃত্তিকার নিম্নে কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল । (কোচবিহারের ইতিহাস , পৃঃ ১৬৬)

'রাজোপাখ্যানে'র মতে (নর খন্ড ৭ম অধ্যায়, পৃ: ২৫)'মহারাজ আদৌ শ্রী শ্রী জল্পেশ্বরের ইষ্টকময় মন্দীর প্রস্তুত করিয়া দিলেন যে এমত মন্দির যে আমার দৃষ্ট মানে এমত আশ্চর্য্য ও এতবড় মন্দির কুত্রাপী দেখি নাই এবং তিনি তিনি বহু দেশ দেখিয়াছেন তাঁহারাও বলেন এমত মন্দির কখনও দেখেন নাই ফলে অমানুষি বৃত্ত্য জ্ঞান হয় পরে গোসানি মারিতে মন্দির ও প্রাচিরাদি উত্তম করিয়া দিলেন এবং বাণেশ্বর মন্ডেশ্বরে মন্দির ও স্থানে স্থানে রাজপথ ও পুল নির্ম্মান করিলেন মহারাজ প্রাণনারায়ণের কির্ত্তি অনেক আছে' ।

'মহারাজ বংশাবলী' মতে রাজা স্বপ্নাদেশ মত কাজলীকুন্ড থেকে দেবী ভগবতীকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । উক্ত গ্রন্থে আছে - 'ভগবতি গোসানি রাজাকে স্বপ্নে আদেশ করিল যে কাজলিকুন্ড মধ্যে নিমগ্ন হৈয়াছি । তুমি শিববংশ রাজা আমাকে উদ্ধার কর । এমত আদেশ হওতে কাজলিকুন্ডে জাল দিয়া ভগবতীকে উদ্ধার করিয়া মঠ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে । তাহাতে পদ্য লিপি অদ্যাপি আছে । পরে ভগবতীর মূর্ত্তি পরিচারক দেওরাইত নিযুক্ত করে ।' (মহারাজ বংশাবলী, রিপুঞ্জয় দাস ও অন্যান্য বিরচিত, নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত, পৃ: ১৪)

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী রচিত'গোসানী মঙ্গল' গ্রন্থে দেখা যায় -

বেহারে হৈল রাজা আপনি ভোলানাথ ।
রাজার ধর্ম্মহেতু প্রজায় পায় তত ।।
বেহারে হইল রাজা বড় ধর্ম্মশীল ।
গোসানীর পূর্ব্ব দেউরী স্থির করি দিল ।।
কত কত ভূমি দিল পূজা করিবার ।
অসংখ্য ছাগ মহিষ বলি জানিবার ।।
আনন্দিত সর্ব্বলোক হইলেক সুখী ।
রামরাজ্য সমরাজ্য নাহি কেহ দুঃখী ।।
ঘরে ঘরে সুমঙ্গল করে সর্ব্বক্ষণ ।
হেন মতে সুখে মগ্ন যত প্রজাগণ ।। পৃ : ৭৪

এই অংশে রাজার নাম উল্লেখ না থাকলেও উদ্দিষ্ট রাজা যে প্রাণনারায়ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই ।১৩০৬ সালে শ্রী ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত'গোসানী মঙ্গলের'পরিশিষ্ট অধ্যায়ে দেখা যায় - 'মহারাজ প্রাণনারায়ণ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মহামায়াকে বর্ত্তমান স্থানে সংস্থাপন করেন । এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ জন প্রবাদ আছে যে কবচ রূপিনী দেবী ভুলা নামক একজন

ধীবরের জালে আবদ্ধ হইয়া স্বপ্নে এইরূপ আদেশ করেন যে' আমাকে কাজলীকুড় হইতে উদ্ধার করিয়া পাট হস্তীর পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন করিতে হইবে, হস্তী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গমন করত যে স্থানে দণ্ডায়মান হইবে তথায় আমার মন্দির নির্মান করিতে হইবে।' উক্ত নির্দেশানুসারে ১৫৮৭ শকে (১৬৬৫ খ্রী) গোসানী মারির বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়।' (রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী লিখিত 'গোসানী মঙ্গল' শ্রী ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ১৩০৬ সালে প্রকাশিত এবং ১৩৭৮ সনে নৃপেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক পুনঃ সম্পাদিত)

মহারাজা প্রাণনারায়ণ বর্তমান কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমায় গোসানী মারিতে যে গোসানী (চণ্ডী) দেবীর মন্দির নির্মান করেছিলেন, তা এখনো ভক্ত ও কৌতূহলী দর্শকদের আকর্ষণ করে।

ব্যক্তিগত জীবন - মহারাজা প্রাণনারায়ণ ভোগ বিলাস পূর্ণ জীবন যাপন করলেও রাজকর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেন এ কথা জয়নাথ মুন্সী লিখিত 'রাজোপাখ্যান' (নব খণ্ড ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ২৫) গ্রন্থে বলা হয়েছে। জয়নাথের মতে প্রাণনারায়ণ' বড় সুখে রাজ্য করিতেন (।) প্রকাশিত আছে মহারাজ প্রাণনারায়ণ ষড়ঋতু মধ্যে পাঁচঋতুতে রাজকার্য্য করিতেন বসন্ত ঋতুর পূর্ব্ব সকল কার্য্য হইতে অবসর হইয়া অতিরম্য স্থলে পুষ্প উদ্যানে পরম সুন্দরি রমণি সকল সমভারে নানা রস ও নৃত্য করিতেন পুষ্পচয়ন পুষ্পমালা গ্রন্থন পুষ্প আভরন পুষ্প শয্যা নির্ম্মান করিতেন ও নানা খেলা হইতে ছিল সেস্থলে পুরুষের গম্য ছিল না বসন্ত ঋতু অতিত হইলে পুনরায় রাজকার্য্য করিতেন আর রাজসভাতে সর্ব্বদা গান বাদ্য নৃত্য হইত(।)' রাজা নিজে গান বাদ্যে ও সংগীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন (।) সংস্কৃত এক পুস্তক রচনা করিয়া ছিলেন অতি আশ্চর্য্য তাল মান সকল বৃহস্পতি অম্বিত করি এমত পুথি অন্য কাহারো কৃত সাধ্য নহে (।) অনেক গান গুনিনে প্রতিষ্ঠা করিত (।) পুথি খানি অগ্নিতে জ্বলিয়া লোপ হইয়াছে তাহার নকল যে কোন খানে আছে এমত শুনি না (।) মহারাজা প্রাণনারায়ণের এই প্রকার অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও ক্ষমতা ছিল।' অপরদিকে বিরূপ মন্তব্যও দেখা যায়। 'কোচবিহারের ইতিহাসে' আমানত উল্লা লিখেছেন - 'সমসাময়িক আহিমে আসাম' পুস্তকে লিখিত আছে যে, রাজা প্রাণনারায়ণের অভিজাত জনোচিত আচার ব্যবহার ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন, মদ্যপান এবং সুন্দরী রমনীগণের নৃত্যগীতাদি উপভোগে সর্বদা রত থাকিতেন এবং সেই সমস্ত কারণে রাজকার্যে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না' (১৬২পৃঃ)

পাণ্ডিত্য ও বিদ্যোৎসাহিতা - সংগীত বিদ্যায় মহারাজার দক্ষতার কথা আমরা আগেই জানতে পেরেছি। জয়নাথ মুন্সী রচিত 'রাজোপাখ্যান' (নরখণ্ড ৭ম অধ্যায় পৃঃ ২৫) গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় 'প্রাণনারায়ণ রাজা হওয়াতে দেশ উজ্জ্বল হইল ধর্ম্ম বৃদ্ধি ধর্ম্মালাপ সর্ব্বত্র হইতে লাগিল রাজা ব্যাকরণ স্মৃতি ও সাহিত্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত দ্রুত কবি শ্রুতধর মহারাজা বিশ্বনারায়ণ যত বালকে পড়িতে দিয়াছিলেন প্রায়স সকলেই পণ্ডিত হইল রাজ সভাতে অনেক পণ্ডিত তন্মধ্যে বিশেষ পাঁচজন তাহাদের দ্বারা পঞ্চরত্নের সভা হইল রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমত পণ্ডিতের সভা হয় নাহি কবিরত্ন কবিভূষণ দুই মন্ত্রী সভাস্থ আবাদিয়া লোকেই পণ্ডিত ভৃত্যবর্গ সমুদয় ও দ্বারি প্রহরি সকলেই সংস্কৃত সমস্কৃত বহির্ভূত অন্য ভাষাতে কথা ছিল না অন্য দেশের রাজাদিগের দূত ও প্রেরিত মন্ত্রী রাজ সভাতে আইশাতে ইতস্ততঃ করিত সর্ব্বদা সর্ব্ব সংস্কৃতালাপ হইত ন্যায় দণ্ডে রাজা শাসন করিতে লাগিলেন (১)'

ঐতিহাসিক আমানত উল্লা বলেছেন' মহারাজা প্রাণনারায়ণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্মৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি" ছিল। কবিতা রচনায় এবং গীত বাদ্যেও তিনি দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থও ছিল; যাহার সাহায্যে রাগরাগিনী ও তাল মান সম্বন্ধে পাঠকের প্রচুর জ্ঞান লাভ হইত। দুঃখের বিষয় যে তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলি পরবর্ত্তী কালে গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত জগন্নাথ 'প্রাণাভরণম্' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহারাজা প্রাণনারায়ণের আদেশে 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণের' প্রভা প্রকাশিকা' টীকা রচনা করিয়াছিলেন' (কোচবিহারের ইতিহাস পৃঃ ১১৩)

উক্ত 'প্রাণাভরণম্' কাব্য বিষয়ে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় একটি নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি তথ্যটি প্রবাসী চৈত্র, ১৩৫১, পৃঃ ৭৪৫ থেকে সংগ্রহ করেছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। 'সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থকার জগন্নাথ পণ্ডিত শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশুকোর স্তব প্রশস্তি করে 'জগদাভরণম্' নামে একটি কাব্য লেখেন। দারার মৃত্যুর পরে জগন্নাথ ঐ কাব্যটিকে 'প্রাণাভরণম্' নাম দিয়ে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের প্রশস্তিতে দাঁড় করান এবং দারার জায়গায় প্রাণনারায়ণের নাম বসান।' (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর - স্বাধীন সুলতানের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খৃঃ) অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, ২য় সং ১৯৬৬, পৃঃ ৩২৮) তথ্যটি অভিনব হলেও এর সত্যতা সম্পর্কে আরও নিঃসন্দেহ হবার মত প্রমাণ প্রয়োজন।

জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণের টীকার সূচনায় পৃষ্ঠপোষক রাজা প্রাণনারায়ণের প্রশস্তি করেছেন এই ভাবে -

'যস্মিন্নতিমতাং ববর্ষতি বিপুলাং ধর্মার্থিনাং শাসতি
শ্রীরামে ধরণীপতাববনি নৃণাং কিন্নুভবিষ্যি স্মৃতিঃ ।
শ্রী গোবিন্দপদারবিন্দ কিলমধুলীকপোস্মর্তে স্বর্গতে
পুত্রাস্তঃ সমবীভূদস্তু বিজয়ী শ্রী প্রাণনারায়ণঃ ।
আনন্দস্যন্দীকৃত শ্রী মধুকবিতা কল্পনা কেলিশালি
প্রজ্ঞাবজ্ঞাত বাচস্পতির তুলগুণ গ্রাম বিশ্রাম ধাম ।।
পাণিপ্রদ্যোতমানামলকফল তুলানম্বিতা শেষবিদ্যাঃ
শ্রী শ্রী প্রাণদেবক্ষিতি পতি তিলকঃ কামরূপোর ভাতি ।'

(কোচবিহারের ইতিহাস পৃঃ ১৬৪ থেকে সংকলিত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতালিকায় (৬১২৪ নং) প্রাণনারায়ণের লেখা 'ক্রিয়াযোগসার' বলে একটি পুথি দেখা যায় । এই পুথিটি অসম্পূর্ণ । পৃষ্ঠা সংখ্যা ২-২৬ , ৩৮-১৫ , লিপিকর রামলোচন শর্মা । হাতের লেখা সুন্দর নয় । অনেক অংশ ছেঁড়া । তবে শেষ অংশ আছে । কোচবিহার পুথি তালিকায় এই পুথির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি । ডঃ মহেশ্বর নেওগ বলেন 'পঁচিশ অধ্যায়ের ক্রিয়াযোগসার'র ভণিতাত প্রাণনারায়ণর নাম আছে ।' (অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা পৃঃ ২১৫)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির দুটি ভণিতা তুলে দিচ্ছি -

ক্রিয়াযোগ পুণ্যকথা শ্লোক অর্থ সারে ।
সকলে না বুঝে তাহা পয়াকৃত করে ।।
এতেক পয়ার শ্লোক অর্থ অভিপ্রায় ।
প্রাণনারায়ণে কহে অষ্টম অধ্যায় । ৩৬-২

অন্য একটি ভণিতায় দেখা যায় -

অসার সংসারে মাত্র সার নারায়ণ ।
পূজহ গোবিন্দ পদ লইয়া স্মরণ ।।
মঙ্গলের বাঞ্ছা লোক যদি মনে থাকে ।
পূজহ গোবিন্দ পদ ভক্তি অতিরেকে ।।
কৃয়াযোগসার কথা সুধাময় সার ।
প্রাণনারায়ণে কহে লোকে বুঝিবার ।। ৪৪-১

উক্ত ভণিতায় যাঁর কবি প্রাণনারায়ণের বৈষ্ণব প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় ।

এই সময়ে দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র 'প্রহ্লাদ চরিত' রচনা করেছিলেন । বিশারদ কবি কর্তৃক বিরাট পর্ব এবং কর্ণ পর্ব অনুবাদিত হয়েছিল ।দামোদর চরিত অবলম্বনে লিখিত'পুরুলীলার' রচয়িতা রামরায়ও সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন । (কোচবিহারের ইতিহাস পৃঃ ১৬০)

'রাজোপাখ্যান' (পৃঃ ২) গ্রন্থে লিখিত আছে মহারাজা প্রাণনারায়ণের মন্ত্রী 'রাজখণ্ডম' নামে সংস্কৃত ভাষায় রাজবংশের ইতিহাস রচনা করেছিলেন ।বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও তা এখন দুর্লভ । কোচবিহারের ইতিহাস প্রণেতা আমানতুল্লার মতে'রাজখণ্ডমে'র রচয়িতা কবিরত্ন । (১৬০ পৃঃ) প্রাণনারায়ণের'পঞ্চরত্ন' পণ্ডিত সভার অন্যান্য পণ্ডিতদের সঠিক নাম জানা না গেলেও ঐ সভাকে সর্বাধিক গৌরব মণ্ডিত করেছিলেন শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ (চক্রবর্তী)নামক কবি, যাঁর রচনা আমাদের বিস্তৃত আলোচ্য বিষয় । এই কবির পূর্বতন কয়েক পুরুষ বিভিন্ন রাজার দরবারের শোভা বর্ধন করেছেন । শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ'কিরাতার্জুনীয়-চরিতম্' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করে ছিলেন । তার ৪র্থ সর্গ ১৭শ পত্রে সমাপ্ত হয়েছে, তবে সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নি । যে অংশ পাওয়া গিয়েছে (অর্থাৎ১৪ থেকে ২২ পত্র) তাতে নরনারায়ণের রাজত্ব কালের কিছু তথ্য পাওয়া যায় । ১৭শ পত্রে'ভূদেব (ব্রাহ্মণ) রামেশ্বরের সৎকবি পুত্র নবীন কবি শ্রীনাথ বিরচিত' এইরূপ ভণিতা আছে । শ্রীনাথ তাঁর 'দ্রোণ পর্বে' আত্ম পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে - পুরুষোত্তম মহামাত্য ভবানন্দ পাঠকের পুত্র পণ্ডিতরায়, তাঁর পুত্র রামেশ্বর, রামেশ্বরের পুত্র শ্রীনাথ ।

শ্রীনাথ বিরচিত মহাভারতের আদি পর্ব সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে । আদিপর্বের একটি বিশেষ অংশ'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' নামে স্বতন্ত্র ভাবেও পাওয়া গেছে । এ ছাড়াদ্রোণ পর্বের ৮৬ পাতা (পুথি নং ১৭) পর্যন্ত ভণিতায় শ্রীনাথের নাম পাওয়া যায় । পরে মহারাজ মোদনারায়ণের (১৬৬৫-১৬৮০ খৃঃ) আজ্ঞায় দ্বিজ কবিরাজ পরবর্তী অংশ রচনা করে অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন । শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের পিতা রামেশ্বরও মহারাজা প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় মহাভারতের পদ রচনা করেছিলেন ।'উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে দুএকটা কথা' প্রবন্ধে শ্রী জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার মহাশয় লিখেছেন'মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় দ্বিজ রামেশ্বর এবং তৎপুত্র শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের পদ রচনা করেন । শ্রীনাথ নামে আর একজন ব্রাহ্মণ আদি পর্বের রচয়িতা ।--- শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রামসরস্বতী রচিত একখানি'ভীষ্ম পর্ব' পাওয়া গিয়াছে । তাহা দেখিয়া ইহাঁকে কুচবিহারের পূর্ব দেশবাসী বলিয়া মনে হয় ।' (পরিচারিকা, নব পর্যায়, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড৫ম সংখ্যা, ১৩২৭ সাল)

কিন্তু কোচবিহার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত (পুথি নং ১৪, ১৫) পুথির মাধ্যমে জানা যায় ভীষ্ম পর্ব কেবল মাত্র রাম সরস্বতী রচিত এবং উহার রচনা কাল প্রাণনারায়ণের অনেক পরবর্তী। তিনি মহারাজা মহীন্দ্র নারায়ণের (১৬৮২ - ১৬৯৩) সমসাময়িক। কি ভাবে শ্রীনাথ ও রামেশ্বরের দুটি নাম এক বলে অনুমিত হলো তা বোঝা যায় না। বসু মহাশয়ের দু' জন শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ধারণাটিও তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

দ্বিজ রাম সরস্বতীর ভীষ্ম পর্বের ভণিতা -

কামতার পতি   মহিন্দ্র নৃপতি
তার আজ্ঞা পরমানে।
নিষ্পদতি রাম   ছাড়ি আন কাম
রাম বোল জত জনে।   ১৪৭-২, ১৪ নং পুথি

আর একটি ভণিতায় দেখা যায় -

বিহারত পুরন্দর মহীন্দ্র নৃপতি।
ভণে দ্বিজ রাম তার নতিয়া সংমতি॥   ১৫৩-২, ১৪ নং পুথি

শ্রীনাথের পিতা রামেশ্বর পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মহাভারত অনুবাদে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন বটে; কিন্তু কোন্ অধ্যায়ের কাজ সুসম্পন্ন করেছিলেন তা জানা যায় না।

পূর্বেই বলেছি দ্রোণ পর্বের পুথিতে ৮৬ পাতা পর্যন্ত শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ভণিতা পাওয়া যায়, পরবর্তী অংশে দ্বিজ কবিরাজের ভণিতা। দ্রোণ পর্বের শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ এবং দ্বিজ কবিরাজকে অনেক বিশেষজ্ঞ একই ব্যক্তি বলে মনে করেন এবং তাদের রচনাকেও একজনের রচনা বলে ধরে নিয়ে থাকেন। কিন্তু এ বিষয়েও তথ্য প্রমাণের অভাবে আমরা এই দুজনকে ভিন্ন কবি ভাবনায় কাজ করছি। দ্বিজ কবিরাজের 'ভীষ্ম পর্বে'র ভণিতায় রচয়িতার নাম থাকলেও কোন পৃষ্ঠপোষকের নাম পাওয়া যায় না, এবং অসম্পূর্ণ এই পুথিটি দেখে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এই ভীষ্ম পর্ব শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনা নয়।

ভীষ্ম পর্বের ভণিতায় দ্বিজ কবিরাজের নাম সুস্পষ্ট -

তাক করিবার যোগ   মনে জানি দেবো লোক
ভীষ্ম দ্রোণ আদি বীরগণে।
জে বলিল ধনঞ্জয়   কহিল সবে সঞ্জয়
দ্বিজ কবিরাজ পদ ভণে॥   ৬১ - ২ (পুথি নং ৮১)

গদা পর্ব :- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে দ্বিজ কবিরাজের গদা পর্ব (নং ৬০) পুঁথি খানি রক্ষিত আছে।

শ্রীনাথের প্রাণনারায়ণ প্রশস্তি - শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ তাঁর বিভিন্ন অনুবাদ কাব্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহারাজা প্রাণনারায়ণের যে স্তব প্রশস্তি কীর্তন করেছেন, তাতে পৃষ্ঠপোষিত ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক অতিকথন কিছুটা রয়েছে ধরে নিলেও বলা যায়, প্রাণনারায়ণ ঐ প্রশস্তির যোগ্যই ছিলেন। সেই সঙ্গে এও বোঝা যায়, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতার ও গুণগ্রাহিতার। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের আদি পর্বের ভণিতায় বলেছেন, প্রাণনারায়ণ মহিপাল ছিলেন সজ্জনের বন্ধু এবং দুর্জনের যম। এই সুবাদে দশদিকে তাঁর যশ প্রচারিত হল। 'সকল গুণের সিন্ধু, সমস্ত সুজন জনার বন্ধু, রসিক সুজান' মহারাজ শিব ও বিষ্ণুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন, তিনি একদিকে ছিলেন 'কাব্যকলা সঙ্গীতের দীক্ষাগুরু' অপর দিকে 'দরিদ্র জনার বাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু'। তিনি নানা শাস্ত্র বিচার করে সকল রসের কূপে পরিণত হয়ে ছিলেন। অন্য এক ভণিতায় শ্রীনাথ মহারাজা প্রাণনারায়ণ কে 'সর্বগুণে রত্নখনি দাতা কর্ণ' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাণনারায়ণ যে কবি ছিলেন সে বিষয়েও বিভিন্ন স্থানে নানা ভাবে উল্লেখ আছে।

দু'একটি ভণিতা তুলে ধরছি :-

ক) কবিতা অমৃত বৃষ্টি করে অনুক্ষণ।
সকল কলায় অলঙ্কৃত বিচক্ষণ।।

খ) রত্নপীঠে মহারাজা প্রাণনারায়ণ।
জয় জগদীশ ডাক বোলে সর্বজন।।
মেদনী মদন দেব ভোগে পুরন্দর।
বিশ্বসিংহ কুল কুমুদিনী দিবাকর।।

শ্রীনাথ তাঁকে একটি ভণিতায় 'পণ্ডিতজন গুণ মধুকর জেন পুষ্প' বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাণনারায়ণকে শ্রীনাথ 'পুরুষ কেশরী এবং বিদগ্ধ জনের গুণ মন্দিরে মুকুট' বলে সম্মানিত করেছেন। অপর এক ভণিতায় রাজাকে 'দাতাকর্ণ হরিশ্চন্দ্র বলির সমান' বলে তুলনা করা হয়েছে।

অন্যত্র কবি বলেছেন -

কামতা নগরে প্রাণনাথ নৃপবর ।
রমণি মোহন রূপ মদন আকার ।।
যেমাত পৃথিবি ক্রোধে কাল সমস্কর ।
প্রতাপতে সূর্য্য জেন গগন উপর ।।
রণে ভিম সমান শহসে যুধমন্ডল ।
জার জসে ব্যাপিল ধরণি মন্ডল ।।

এই ভণিতাগুলির মধ্য দিয়ে কবি যেমন তাঁর পৃষ্ঠপোষকের রূপগুণ বর্ণনা করেছেন, তেমনি ভীমের সঙ্গে তাঁর শৌর্যের তুলনা করে তাঁকে অপার মহিমা দান করেছন ।

দ্রোণ পর্বের ভণিতায়ও দেখা যায়, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ পৃষ্ঠপোষকের গুণ সায় মুখর -

ক) জয় জয় মহারাজ প্রাণনারায়ণ ।
জগম জন্দিশ জাক বলে সর্ব্বজন ।।
দানে বলি কর্ণ রূপে মেদিনি মদন ।
রণে বৈরি বারণ দারুণ পঞ্চানন ।।
কবিতা গুণত অভিনব কালিদাস ।
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য কিণুল মাহাস ।।
....
পুণ্যকীর্তি জগত ব্যাপিল সমুদায় ।
শঙ্খ মুক্তা মৃণাল কুমুদ কুন্দ প্রায় ।।
....
জার তুলা পুরুষ দানত পায়া ধন ।
দরিদ্রের স্ত্রীর হৈল সোনার কঙ্কন ।।
দানি মানি বিদগ্ধ পুরুষ পুরন্দর ।
বিলাসত গন্ধর্ব্ব রাজের সমসর ।।

খ) নিমার হিন্তার হার মংধ মুক্তি সুকুমার
কুন্দ কাশ কার্পাস ধবলা ।
যশ কিত্তি অনুপাম সকল দিগন্ত সিমা
ধরণি চকার মহোন্দলা ।।

গ) তিনি বৃহস্পতি গুণে মহীপতি
দানে কর্ণ তরুবির ।
প্রতাপে ভাস্কর ভোগে পুরন্দর
সমুদ্র যেন গম্ভির ।।
প্রকৃত সংস্কৃত নাটক সঙ্গিত
কাব্য কোষ অলঙ্কার ।
মাথুর মগধ অঙ্গ বিশারদ
সাহসে সিংহ কুমার ।।
মনোহর তনু যেন পুষ্প ধনু
ধনুর্দ্ধর শিরোমণি ।
কৃষ্ণ পরায়ণ গুণনারায়ণ
দৈব পুণ্য রত্নখানি ।।